যথোচিত উদ্যোগের অভাবই তরুণদের বইবিমুখতার মুখ্য কারণ:

মিনার মনসুর

[কবি ও গবেষক মিনার মনসুর। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বরলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পড়াশোনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি-সচেতন কবি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করেছেন কবিতায়।
পঁচাত্তর-পরবর্তী চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছেন 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' শিরোনামে বই। তাঁর উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা' (১৯৯৫); 'মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত বীর যোদ্ধারা' (২০০৮), 'বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও উন্নয়ন: বিশিষ্টজনের ভাবনা' (২০১০)।
বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে কাজ করছেন বইপড়া কর্মসূচি, পাঠাগার আন্দোলন ও প্রতিযোগিতা নিয়ে। অন্যদিকে বইমেলা হওয়া না হওয়া নিয়ে লেখক-পাঠকদের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া চলছে। এ নিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে তাঁর ভাবনাসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন কবি **ইমরান মাহফুজ**।]

সামাজিক মুক্তিতে বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে কতটা অনুভব করেন। তথা জ্ঞান ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বই কতটা সহায়ক?

মিনার মনসুর: খুব সংক্ষেপে বললে, তথ্যপ্রযুক্তির এই মহাবিপ্লবের কালেও বইয়ের বিকল্প কেবল বই, বই এবং বই। এটি কোনো আবেগের কথা নয়, দেশকাল নির্বিশেষে দীর্ঘ পথ হেঁটে অনেক অভিজ্ঞতার আগুনে দগ্ধ হয়ে এটাই হলো বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর সর্বজনীন ও সর্বসম্মত অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞান। শত শত বছর ধরে এটা প্রমাণিত যে, সামাজিক মুক্তি শুধু নয়, দৃশ্য-অদৃশ্য যত ধরনের শৃঙ্খল মানবসমগ্রের অগ্রযাত্রাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং করছে। তা থেকে মুক্তির মন্ত্র নিহিত আছে কেবল বইয়ের নিরাবেগ বক্ষে। বাইরের সব আলো নিভে গেলেও বইয়ের আলো কখনোই নির্বাপিত হয় না।

বই প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত ও লাভজনক শিল্পে পরিণত করতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আপনার সময়কালে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

মিনার মনসুর: প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে, এটি একটি বিশাল, বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদী কাজ। সরকারের একার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রকাশকদের ভূমিকা মুখ্য হলেও লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত ও আন্তরিক উদ্যোগ দরকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের প্রকাশনা খাতের ব্যাপক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কার্যকর, সুচিন্তিত ও দূরদর্শী উদ্যোগের অভাব অত্যন্ত প্রকট।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর প্রকাশকদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকার বই ক্রয় করে তা আট শতাধিক বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান হিসেবে বিতরণ করে থাকে। পাশাপাশি, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করা হয়। উৎসাহিত করা হয় বইমেলা ও বইভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণে। দেশের বাইরে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা, কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলাসহ বেশ কিছু বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগও সৃষ্টি করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই, সেটি হলো প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

ঢাকার মতো বইমেলা সারা দেশে হয় না। তথাপি মেলাকেন্দ্রিক বইপ্রেমকে কীভাবে দেখছেন?

মিনার মনসুর: আমাদের প্রকাশনা খাতের শিল্প হয়ে ওঠার পথে যে ক'টি অন্তরায় রয়েছে; তার মধ্যে এই 'মেলাকেন্দ্রিক বইপ্রেম' অন্যতম বললে বোধ করি খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। অমর একুশে বইমেলা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার অন্যতম বৃহৎ ও মহৎ উৎস। উৎসবও বলা চলে। তবে ভুললে চলবে না যে, এটি নিছক বইয়ের মেলা মাত্র নয়। বরং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকারের মিলনমেলাও বটে। একুশের প্রভাতফেরিকে ঘিরে যার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি; যার সূত্রপাত সেই পঞ্চাশের দশকে–বইমেলা শুরু হওয়ার বহু বছর আগে এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনার ক্ষেত্রেও এর নিয়ামক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, অমর একুশের এই চেতনাধারার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে সৃজনশীলতার বিশাল এক কর্মযজ্ঞ–যার নাম অমর একুশের বইমেলা। মাসব্যাপী এই বইমেলা আমাদের প্রকাশনা খাতের জন্যে বিশাল প্রণোদনা হিসেবে কাজ করছে সন্দেহ নেই। ফলে বহু বছর ধরে প্রকাশকদের সাংবাৎসরিক কর্মতৎপরতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই বাস্তবায়িত ও পরিচালিত হয় এই বইমেলাকে ঘিরে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, প্রকাশনাকে পরিপূর্ণভাবে শিল্প হয়ে উঠতে হলে অবশ্যই এই নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে হবে। বছরব্যাপী বই প্রকাশ ও বিপণনের বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

সম্প্রতি জেনেছি, বেসরকারি গ্রন্থাগারের জন্য একজন করে হলেও অন্তত গ্রন্থাগারিক সরকারি সম্মানির আওতাভুক্ত হবেন। সে-বিষয়ে কিছু বলবেন?

মিনার মনসুর: বর্তমানে ব্যক্তি বা পারিবারিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি পাঠাগারগুলো সচল রাখা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিল তিল করে যে পাঠাগারগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সেসব পাঠাগারের দরজা খোলা রাখার মতো কর্মী খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। এর পেছনে যে-আর্থসামাজিক বাস্তবতা রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি এমন অনেক পাঠাগারের কথা জানি, যার উদ্যোক্তারা সারাদিন চাকরি করে সন্ধ্যায় এসে পাঠাগারের দরজা খুলে বসেন। নিজেরাই দৌড়ঝাঁপ করে বই সংগ্রহ করেন। কিন্তু বেশিরভাগ

পাঠাগারের পক্ষে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যাটি সম্পর্কে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটিসহ আমরা সবাই অত্যন্ত সচেতন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আন্তরিকভাবে কার্যকর কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শুরু থেকেই। এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তিনি খুব উদ্যমী মানুষ। আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

গত বছর 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শিরোনামে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন। এতে তরুণদের মধ্যে নতুন কী আলো দেখেছেন?

মিনার মনসুর: আমি অভিভূত বললে কমই বলা হয়। এটি ছিল একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি। আপনি জানেন, করোনার কারণে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে বিশ্বজুড়েই একটা অচলাবস্থা চলছে। আমাদের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ। পাঠাগারগুলোয় ধুলো জমছে। লাখ লাখ কিশোর-তরুণ শুধু যে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছে তা-ই নয়, আগে থেকেই কিশোর-তরুণদের বইবিমুখতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় তাদের আসক্তি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। এদিকে বহুল প্রত্যাশিত মুজিববর্ষকে সামনে রেখে গৃহীত আমাদের প্রায় সব কর্মসূচিই স্থগিত হয়ে গেছে।

এরকম দম বন্ধ করা একটি অবস্থায় রাজধানীর স্বনামখ্যাত ১০টি পাঠাগারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' কর্মসূচিটি গ্রহণ করি। আমরা তিনটি গ্রুপে স্কুলের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', কলেজের শিক্ষার্থীদের 'কারাগারের রোজনামচা' এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 'আমার দেখা নয়াচীন' বই তিনটি পড়তে দেই। আমাদের টার্গেট ছিল ১৫০ জন শিক্ষার্থী। করোনার কারণে শিক্ষার্থীরা আদৌ এ ব্যাপারে আগ্রহী হবে কি না তা নিয়ে আমাদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু বাস্তবে কয়েক গুণ বেশি শিক্ষার্থীর সাড়া আমরা পেয়েছি। বই তিনটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যে-পাঠপ্রতিক্রিয়া লিখেছে, দেশবরেণ্য তিনজন বিচারক তা মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা হলেন–অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক মফিদুল হক। তিন জনই অভিভূত হয়েছেন এবং একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, কিশোর-তরুণরা বই পড়তে চায় না বলে যে অভিযোগটি প্রায়শ আমরা করে থাকি; তা সত্য নয়। বস্তুত যথোচিত উদ্যোগের অভাবই তরুণদের বইবিমুখতার মুখ্য কারণ বলে আমাদের মনে হয়েছে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে ও জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে গ্রন্থকেন্দ্রের নতুন আর কী কী পরিকল্পনা আছে?

মিনার মনসুর: এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন। বলতে পারেন, এটিই গ্রন্থকেন্দ্রের মূল কাজ। মূলত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। গ্রন্থকেন্দ্রের বয়স এখন পঞ্চাশের বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে কাজ তেমন হয় নি কিংবা হলেও তা সমাজে স্থায়ী কোনো প্রভাব তৈরি করতে পারে নি।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মহালগ্নে আমরা এখন সেদিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছি, যদিও এক্ষেত্রে জনবলসহ নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইতোমধ্যে আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি খুবই সফলভাবে। অতি সম্প্রতি বেসরকারি পাঠাগারগুলোকে সম্পৃক্ত করে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক জাতির পিতার তিনটি গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। এতে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে 'মুজিব শতবর্ষে শত পাঠাগার'–এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের একশটি সেলুনে 'সেলুন লাইব্রেরি' চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার/গ্রামে গ্রামে পাঠাগার'–এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আমরা বইপড়া কার্যক্রমকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। বই শুধু পাঠালেই হবে না, সব বয়সী মানুষকে বইমুখী করার জন্য সুচিন্তিত উদ্যোগও থাকতে হবে। আমরা সেদিকটাতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছি।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি– 'সচরাচর কবি-সাংবাদিকদের দিয়ে প্রশাসনিক কাজ হয় না' বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু আপনি সেই প্রবাদবাক্য ভুল প্রমাণ করেছেন। কীভাবে সম্ভব?

মিনার মনসুর: সেটি কতটা পেরেছি কিংবা আদৌ পেরেছি কি না আমি নিশ্চিত নই। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নিয়ত বা উদ্দেশ্যর সততা, সুদৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে যেকোনো কঠিন কাজই সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আমার দীর্ঘ ও বিচিত্র কর্মজীবনে আমি বারবার তার প্রমাণ পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত, যে জিনিসটি দরকার সেটি হলো আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস আসে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে, শিক্ষা থেকে এবং অবশ্যই অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থেকে। কাজ বলি আর দায়িত্বই বলি–তাকে ভালোবাসতে হয়, উপভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে গীতায় যাকে 'নিষ্কাম কর্ম' বলা হয়েছে সেই দীক্ষাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, আমাকে যারা চেনেন-জানেন তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমার এ-ক্ষুদ্র জীবনের সব পর্যায়ে সব কাজে আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন বা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আমি কখনও জ্ঞানত ব্যক্তিগত লাভালাভ, প্রাপ্তি বা খ্যাতির পেছনে ছুটি নি।

আপনি পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছেন 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ'। অনেকে বলেন এ অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আপনি গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক। কীভাবে দেখেন বিষয়টি?

মিনার মনসুর: আপনি জানেন, 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত প্রথম সংকলনগ্রন্থ। এ-গ্রন্থটি প্রকাশ করার আগে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর তৃতীয় শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা 'এপিটাফ' নামে

একটি লিটলম্যাগ বের করেছিলাম। লেটারপ্রেসে মুদ্রিত সেই ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদ জুড়ে ছিল বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী। ভেতরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু গদ্য ও কবিতা। ভাবুন তো একবার, সপরিবারে জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ঘাতকরা যখন ক্ষমতায়–তাদের জিহ্বা তখনও রক্তলোলুপ, সেই সময়ে ১৮ বছর বয়সী সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত দুজন তরুণ স্বনামে, স্বঠিকানা ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ ধরনের কাজ করছে! এর জন্যে কতটা দায়বদ্ধতা, দেশাত্মবোধ ও দুঃসাহস লাগে, তা এখন অনুমান করাও কঠিন। কোনো ধরনের প্রাপ্তির প্রত্যাশা তো দুরস্ত, আমরা আমাদের জীবনটাকেই বাজি ধরেছিলাম তখন।

ঠিক স্বীকৃতি কিনা জানি না, তবে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমার উপর অর্পিত দায়িত্বটি আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান। সেই শৈশবেই বই, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ–এই তিনকেই শিরোধার্য করেছিলাম। এখন কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এরকম একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছি, যেখানে এ-তিনের অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে–এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে!

পড়েছেন বাংলায়, লেখেন কবিতা, করেছেন গবেষণা ও সাংবাদিকতা। গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্বকে কেমন উপভোগ করেন?

মিনার মনসুর: কাজটি কঠিন ও শ্রমসাধ্য হলেও দায়িত্বটি সত্যিই আমি উপভোগ করছি। কেন উপভোগ করছি তা আমি আগেই বলেছি। কাকতালীয় বিষয় হলো, আমি আমার সামান্য জীবনে যা যা করেছি, শিখেছি এবং স্বপ্ন দেখেছি–সবকিছুর সঙ্গেই দায়িত্বটির নিবিড় যোগ রয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর আপনার লেখালেখি, গবেষণা ও সম্পাদনার কাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

মিনার মনসুর: একটি সংস্থার প্রধান নির্বাহীকে নানা ধরনের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিপুল সময় ও শ্রম দিতে হয় এ-দিকটায়। তার ওপর তো সংস্থার বার্ষিক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব থাকেই। থাকে জাতির স্বপ্ন ও প্রত্যাশার আলোকে প্রতিষ্ঠানটিকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়ার স্বকীয় সৃজনশীল কিছু ব্যাপারও। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার পড়া, লেখাসহ সৃজনশীল ও সামাজিক কাজে একেবারেই সময় দিতে পারছি না। এর জন্য তীব্র মনোকষ্ট আছে। তবে এটাকে ঠিক ক্ষতি বলতে চাই না, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করতে পারছি–এও তো কম গৌরবের বিষয় নয়।

রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক সংকটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা নিয়ে আপনার মতামত জানতে আগ্রহী–

মিনার মনসুর: দেখুন, আমরা যখন শিক্ষাজীবন শুরু করি তখন সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হাতেগোনা কয়েকটি। এখন তা শত ছাড়িয়ে গেছে। অথচ সেরকম কোনো গবেষণাকর্ম কি চোখে পড়ছে? এমনকি এই যে মুজিববর্ষ চলছে, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন নিয়ে কি উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়েছে? আপনি দেখবেন, যখন দেশে মাত্র চার-পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তার প্রভাব সারা দেশ অনুভব করেছে। আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সংগ্রামকে প্রাণসঞ্চার করেছে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু এখন? আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় বাড়লেও তারা তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। কেন পারছে না, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই ভালো বলতে পারবেন।